২৫শে সংবাদ পরিষেবা
ফেব্রুয়ারি - ২০২০

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

‘অর্থহীন’ কৃষি বাজেট ২৫/৬৮

সুব্রত কুন্ডু

গত ৬ বছর ধরে ভারতের কৃষির কোনো উন্নতি হয়নি-একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের আর্থিক সমীক্ষায় একথাই বলা হয়েছে। তবে নোটবন্দী এবং অপরিকল্পিত জিএসটি’র জন্য গত তিন বছর ধরে দেশের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে কৃষি-অর্থনীতির অবস্থাও ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। এখন তো মন্দার পরিস্থিতি। এই অবস্থা থেকে ভারতের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য বাম, দক্ষিণ, মধ্য, সব ধারার অর্থনীতিকরা চাহিদা বাড়ানোর দিকে জোর দিতে বলছিলেন বহুদিন ধরে। আর চাহিদা বাড়ানোর জন্য কৃষি এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে অর্থ জোগানের কথাও তাঁরা বলছেন। যুক্তি, সাধারণ মানুষের হাতে অর্থ এলে তারা বিভিন্ন সামগ্রী খরিদে উৎসাহী হবে। চাহিদা বাড়বে। শিল্পগুলি উৎপাদন করতে উৎসাহী হবে। কাজ সৃষ্টি হবে। সব মিলিয়ে অর্থনীতিও কিছুটা হলেও জীবন পাবে।

এই প্রেক্ষিতে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আসুন দেখে নেওয়া যাক, তার হিসেবনিকেশ। তবে টাকাপয়সার হিসেবে ঢোকার আগে এটা বুঝে নেওয়া দরকার, মুদ্রাস্ফীতি, বাজারদর ইত্যাদি বৃদ্ধির কারণে টাকার দাম কমে। ফলে কোনো একটি খাতে টাকা বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও, তা অনেক সময়েই আগের বছরগুলির তুলনায় কম বরাদ্দেরই সমতুল।

কৃষির পুনরুজ্জীবনের জন্য অর্থমন্ত্রী, তাঁর বাজেট বক্তৃতায় ১৬ দফা পদক্ষেপের কথা বলে কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন যে, দেশের কৃষি ধুঁকছে -তার পুনরুজ্জীবন দরকার।

কৃষি ও গ্রামীণ খাতে এবং এর সঙ্গে জড়িত নানা কাজের জন্য গতবারের মোট বাজেটের ৯.৬ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ ছিল। আর এবারে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৯.৩ শতাংশ অর্থ। অর্থাৎ শতাংশের হিসেবে বরাদ্দের পরিমাণ আগের থেকে কমেছে। কৃষি এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রর বরাদ্দ আলাদা করলে দেখা যাবে, কৃষিকাজে গত বছরে বরাদ্দ ছিল ১.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা। এ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ১.৪৩ লক্ষ কোটি। টাকার হিসেবে বৃদ্ধি মাত্র ৩ শতাংশ। গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন প্রকল্পে এ বছরে বরাদ্দ কমে হয়েছে ১.২০ লক্ষ কোটি যা আগের বছর ছিল ১.২২ লক্ষ কোটি।

বরাদ্দ কমেছে ১০০ দিনের কাজে ২৫/৬৯

এই আর্থিক বছরে গতবারের তুলনায় প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা কম রাখা হয়েছে, ১০০ দিনের কাজে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের হিসেব অনুযায়ী এই খাতে খরচ হতে পারে প্রায় ৭১ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি বলে সরকার জানিয়েছে। কিন্তু

এ বছর বরাদ্দ হয়েছে ৬১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা । মনে রাখা ভালো, গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণে ১০০ দিনের কাজের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। এতে বরাদ্দ কমা মানে কাজের পরিমাণ কমা। এছাড়া ১০০ দিনের কাজে কৃষি উন্নয়নের জন্য বেশিরভাগ কাজ হয়। ফলে এ বছর চাষের কাজেও ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়।

ফসল কেনায় কোপ

এ বছর চাষিদের থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল কোনার টাকা এক ধাক্কায় ৫০ শতাংশ কমিয়ে করা হয়েছে ৭৫ হাজার ৫০০ কোটি। যা গত বছরে ছিল ১ লক্ষ ৫১ হাজার কোটি । এতে সরকারের কাছে শস্য বেচার সুযোগ কমিয়ে, বেসরকারি ক্ষেত্রের দয়ায় উপরে ছেড়ে দেওয়া হল চাষিদের। মন্ত্রী, তাঁর বক্তব্যেও খোলা বাজারের প্রতিযোগিতার দিকে চাষিদের আরো বেশি করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাই বলেছেন।

আমাদের রাজ্যে এ বছর ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে এক কুইন্ট্যাল ধানের দাম ১৮৩৫ টাকা। কিন্তু অভাবি বিক্রি এবং ফড়েদের কারসাজিতে ১৪০০-১৫০০ টাকায় ধান বিক্রি করছে চাষিরা। এ ছবি দেশের সর্বত্রই। তাই বরাদ্দ কমায় সামনের বছর চাষিদের অবস্থা আরো সঙ্গীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েই যায়।

গণ-বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল মানুষদের খাবার জোগানো সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। মূলত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের মাধ্যমে যে ফসল সংগ্রহ হয়, তা গণ-বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। আর তাই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের খাতে ব্যাপক কাটছাঁটের প্রভাব গণ-বণ্টন ব্যবস্থায় পড়তেও বাধ্য।

দ্বিগুণ আয়ের ধোঁকা

২০১৭-১৮ বাজেটের সময় ঢাকঢোল পিটিয়ে, ২০২২-এর মধ্যে চাষিদের আয় দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এবছরও অর্থমন্ত্রী সেই কথাই বলেছেন। সরকারেরই তথ্য বলছে, ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে কৃষিতে বৃদ্ধির হার ছিল সাড়ে তিন শতাংশ। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ এই দুই আর্থিক বছরে বৃদ্ধির হার কমে হয়েছে তিন শতাংশের কিছু বেশি। অর্থাৎ, ২০১৭ সালের মার্চে যে চাষির ১০০ টাকা আয় ছিল, ২০২০ সালের মার্চে তা বড় জোর ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা হবে। যদিও এটা প্রকৃত আয়ের হিসেব। সরকারের মতে, এই প্রকৃত আয়ের সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির হার ধরলে আসল আয় পাওয়া যাবে। সেই হিসেবেও ২০২০ সালে চাষির আয় হবে, খুব বেশি হলে ১২৫ টাকা। আর তাই ২০২২ সালের মধ্যে চাষির আয় ২০০ টাকা করতে হলে আগামী দুই অর্থবর্ষে কৃষিতে বৃদ্ধির হার হতে হবে বছরে ২৬.৪৯ শতাংশ। কোন্ যাদুতে এটা সম্ভব তা অর্থমন্ত্রী বা সরকারই জানে।

বিমা কোম্পানির মুনাফা

২০২০-২১ অর্থবর্ষে কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে ১৫ লক্ষ কোটি টাকা। আগের বারের চেয়ে এটা ১১ শতাংশ বেশি। আর ১৫ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে ফসল বিমা যোজনায়। এর মাধ্যমে মোট ৬ কোটি চাষিকে ফসল বিমার আওতায় আনা হবে, বলেছেন অর্থমন্ত্রী। তবে অনেকেই এই বিমাকে একটা বড় দুর্নীতি বলছে। কারণ, প্রথমত ফসলের বিমা চাষিদের না জানিয়েই করা হচ্ছে। কোনো চাষি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিলে সরাসরি বিমার আওতায় আসছে। আর স্বতঃস্ফূর্ত বিমাকারীর সংখ্যার ২ শতাংশ, যারা 'বড় চাষি'। বিমার ক্ষেত্রে চাষি, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার পয়সা দেয়। কিন্তু ফসলের ক্ষতি হলে বিমার টাকা পেতে যেসব শর্ত চাপানো হয়, তা পূরণ করা বেশ মুশকিল। কারণ একজন—দুজন নয়, গোটা এলাকার ফসল নষ্ট হলে তবেই বিমার টাকা পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় যেসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব হয়, তাতে গোটা এলাকার ফসলের ক্ষতি হলেও বিমা কোম্পানিগুলি টাকা দেয় না। এসব নিয়ে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা সিএজি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল তাদের ২০১৭-র রিপোর্টে।

২০১৮ সালে মহারাষ্ট্রের পারভানি জেলায় ২.৮ লক্ষ চাষি সয়া চাষ করেছিল। এজন্য চাষিরা ১৯.২ কোটি টাকা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়ই ৭৭ কোটি টাকা করে বিমার প্রিমিয়াম দিয়েছিল। মোট প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছিল ১৭৩ কোটি টাকা। বিমা কোম্পানির নাম রিলায়েন্স ইন্সিওরেন্স। এই কোম্পানি খোঁজ খবর করে মাত্র ৩০ কোটি টাকা দিয়েছিল চাষিদের। এই ৩০ কোটি বাদ দিলে সেবছর একটি জেলা থেকেই কোম্পানিটির আয় হয়েছিল ১৪৩ কোটি টাকা। সাদা চোখে দেখলে এতে

বেনিয়ম কিছু নেই। কিন্তু বিমা প্রকল্প যেভাবে তৈরি, যেভাবে এর তথ্য রাখা হচ্ছে, যেভাবে চাষিদের থেকে একপ্রকার জোর করেই বিমা করানো হচ্ছে - তাতে চাষিদের ফসলের বিমা বলা হলেও আসলে বিমা কোম্পানিগুলির লাভের জন্য এই প্রকল্পটি তৈরি। সুতরাং এই খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর উদ্দেশ্য, রিলায়েন্সের মতো ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি।

কৃষির শিল্পায়ন

সহজে পচে যায় এমন কৃষি সামগ্রী - সবজি, ফল, দুধ, মাংস ও মাছ রেলপথের মাধ্যমে যাতে দ্রুত দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হিমঘরে পাঠানো যায় তার জন্যেই, কিষান রেল চালানো হবে বলে অর্থমন্ত্রী বাজেটে উল্লেখ করেছেন। এর ফলে দেশের মধ্যে কোল্ড সাপ্লাই চেন তৈরি করা যাবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অর্থাৎ পিপিপি মডেলে কিষান রেলের কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি কৃষি-উড়ান নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমেও আকাশপথেও চাষিরা শস্য নিয়ে যেতে পারবে, দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এর জন্য অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের সঙ্গে একটি চুক্তি করা হবে।

কৃষি সামগ্রী সংরক্ষণের লক্ষ্যে (ন্যাশনাল ব্যাংক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট) চাষিদের সহায়তা করার জন্য জিওট্যাগ কোল্ড স্টোরেজ এবং গুদামজাতকরণের একটি মানচিত্র তৈরি করবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই জাতীয় আরো সুবিধার বিষয়ে জোর দেবে এবং পিপিপি মডেলে কাজ করার বিষয়ে উৎসাহিত করবে। আগেই বলা হয়েছে, সরকার চায় বাজারের হাতে-নির্দিষ্টভাবে বললে বড় বড় কোম্পানির হাতে চাষ তুলে দিয়ে কৃষির শিল্পায়ন করতে। কিষান রেল, কিষান উড়ান, কোল্ড স্টোরেজ চেন ইত্যাদি সেই উদ্যোগেরই অংশ। কারণ এইসব বড় প্রকল্পে ছোট এবং প্রান্তিক চাষিরা তাদের সামান্য উৎপাদন নিয়ে ঢুকতে পারবে না—আত্মসমর্পণ করবে বাজারের হাতে।

শিল্পের জন্য চাষির সংস্থা ২৫/৭৪

গত বাজেটে অর্থমন্ত্রী ৫ বছরে ১০ হাজার ফার্মার্জ—প্রোডিউসার্স অরগানাইজেশন বা এফপিও তৈরির কথা বলেছিলেন। এবছরেও বলা হয়েছে এফপিও-র কথা। এফপিও হল চাষিদের সংস্থা/কোম্পানি। যেখানে একজোট হয়ে চাষি তার চাষের সামগ্রী এবং উৎপাদন কেনাবেচা করবে বাড়তি কিছু লাভের জন্য। মূলত ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত সরকার এই ধরনের সংস্থা তৈরিতে উদ্যোগ নিচ্ছে।

আমাদের দেশ মূলত ছোট এবং প্রান্তিক চাষি অধ্যুষিত। দেশের মোট চাষির ৮৬.২ শতাংশ ছোট এবং প্রান্তিক চাষি এবং তাদের গড় জমির পরিমাণ ১ হেক্টর বা সাড়ে সাত বিঘার মতো। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের চাষি ৯৬ শতাংশ। আর তাদের গড় জমির পরিমাণ ৬ বিঘারও কম। এই চাষিদের উৎপাদনশীলতা বড় চাষিদের থেকে বেশি হলেও ছোট জমির দরুন ফলন কম। এই চাষিদের সবার সঙ্গে আলাদা আলাদা দরদাম করে ফসল কেনা, বড় কোম্পানির জন্য লাভজনক নয়। তাই এদের একজোট করতে পারলে সরাসরি অনেকটা সামগ্রী কেনা যাবে বা তাদেরকে চাষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করা যাবে। আর ফড়েদেরও পুরো প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে। এসব মিলিয়ে কোম্পানিগুলির মুনাফাও বাড়বে। ফলে প্রসার ঘটাও এফপিও-র। কিষান রেল, কিষান উড়ান, কোল্ড স্টোরেজ চেন, এফপিও ইত্যাদি তাই ভিন্ন কর্মসূচি নয়, কৃষির শিল্পায়নের এক একটি অংশ মাত্র।

সেচ সৌরশক্তি

সরকার এবছর ২০ লক্ষ চাষিকে স্বতন্ত্র সোলার বা সৌরশক্তির পাম্প সরবরাহ করবে। আর ১৫ লক্ষ চাষিকে সৌরশক্তি চালিত ও গ্রিড-সংযুক্ত পাম্প সেট দেবে। এতে বৃষ্টি-বিঘ্নিত অঞ্চলগুলিতে সুষ্ঠু উপায়ে চাষের সম্প্রসারণ হবে। কিন্তু জল কীভাবে পাওয়া যাবে তার উৎস সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। মনে হয় মাটির তলার জল এবং নদী ও পুকুর থেকে জল তোলার কথা ভাবা হয়েছে। সৌরশক্তির কথা শুনে ভালো লাগল, তবে মাটির তলার জল তুললে দূষণ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

মনে রাখা দরকার, এদেশে বড় বড় বাঁধ থেকে সেচের যা জল সরবরাহ করা হয় তার মাত্র ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কাজে লাগে, বাকিটা নষ্ট হয়ে যায়। এর কিছুটাও যদি বাঁচানো যেত, তবে ৩৫ লক্ষের অনেক বেশি চাষি সেচের জল পেতে পারত। আর কম জলের ফসলের চাষে সরকার সবরকম উৎসাহ দিলে চাষের পরিমাণও বাড়ত।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায়

'শূন্য খরচের চাষ'

সরকার বছরে গড়ে ৭০-৮০ হাজার কোটি টাকা খরচ করে রাসায়নিক সারের জন্য। এবারে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭১ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা। আমাদের দেশে ৫২ শতাংশ জমিতে বৃষ্টির জলে চাষ হয়। এখানে রাসায়নিক সার কম লাগে। এছাড়া পাহাড়ি অঞ্চলের চাষেও এই সারের ব্যবহার খুবই কম। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, রাসায়নিক সার ব্যবহারে উৎসাহ না দিয়ে, জৈবসহ সব ধরনের সারের সুষম ব্যবহারকেই উৎসাহিত করবে সরকার। গতবারের মতো এবারেও তাই 'জিরো বাজেট' ন্যাচরাল ফার্মিং অর্থাৎ শূন্য খরচে প্রাকৃতিক চাষে উৎসাহ দেবে সরকার। কিন্তু গত এক বছরে, এই চাষের কী অগ্রগতি হয়েছে তার কোনো তথ্যই সরকারের কাছে নেই। আর একদিকে 'শূন্য খরচের চাষ' আর অন্যদিকে 'সব ধরনের সারের সুষম ব্যবহার'- এর কথা তাই পরস্পর বিরোধী।

সরকার ২০১৬ সালে বিষমুক্ত চাষের টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল। এই টাস্ক ফোর্স বছরে কমপক্ষে ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছিল এই খাতে। কিন্তু গতবছর বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪৮৭ কোটি টাকা। আর এবছর বরাদ্দ করেছে ৬৮৭.৫ কোটি টাকা। যদিও প্রতি বছরের শেষে দেখা যাচ্ছে বরাদ্দ টাকার তুলনায় কম খরচ হচ্ছে।

নীল অর্থনীতি

সামুদ্রিক সম্পদ থেকে আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে বাজেটে বলা হয়েছে যে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে ২০ কোটি টন করা হবে, যাকে ব্লু ইকোনমি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এই আয় বাড়ানো হবে তার কোনো দিশা বাজেটে নেই। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে এ খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৭০ কোটি টাকা যা গতবারের বরাদ্দের থেকে ১০ কোটি টাকা বেশি। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট বলছে, বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগর অঞ্চলে সামুদ্রিক সম্পদ ক্রমশ কমছে। কারণ, এই দুই সাগরের কিনার ঘেঁসে পৃথিবীর জনসংখ্যা বহুল দেশগুলি রয়েছে। ফলে প্রচুর চাপে এই দুই সাগরের সম্পদের পরিমাণ কমছে। এই অবস্থায় কীভাবে তথাকথিত ব্লু ইকোনমি টিকবে, তা নিয়ে যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

চাষে মহিলায়ন

ফসল সংরক্ষণ, উদ্যান-পালন এবং আরো কৃষি বিষয়ক কাজে নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। আর উদ্যান-পালনের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে, সরকার '১ পণ্য, ১ জেলা' নামে একটি প্রস্তাব রেখেছে। মানে যে জেলায় যে কৃষি সামগ্রী সব থেকে ভালো আর বেশি উৎপাদন হয়, সেই সামগ্রীর চাষে উৎসাহ, ইন্ধন সরবরাহ, পরিবহন, বাজার ইত্যাদি তৈরিতে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের অধীনে মহিলা কিষান সশক্তিকরণ পরিযোজনার মাধ্যমে আগের সরকারের সময় থেকেই নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি চাষের কাজ করছিল। বেশ কিছু রাজ্য সরকার, অ-সরকারি সংস্থা বা এনজিও একাজে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল। কিন্তু এখনো অবধি কেন্দ্র এ কাজের কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি। ফলে এই পরিকল্পনাও খুব একটা আশা জাগাতে পারবে না বলেই মনে হয়।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, চাষে বরাবরই মহিলারা বেশি কাজ করে পুরুষদের থেকে। তবুও ফসলের জমি, দাম ইত্যাদিতে তাদের কোনো অধিকার নেই। বর্তমানে সারা দেশ জুড়ে অর্থের প্রয়োজনে, চাষি পরিবারের পুরুষরা বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে চাষের কাজের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ছে মহিলাদের ওপরে। অর্থাৎ চাষে মহিলায়ন হচ্ছে। কিন্তু জমির অধিকার নেই বলে সরকারি প্রকল্প, পরিষেবা, সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী বা সরকারের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই।

জলবায়ু বদল

আইপিসিসি বা ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এর হিসেব অনুযায়ী, সারা বিশ্বে বর্তমানের থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লে কৃষিতে ১০ শতাংশ উৎপাদন কমবে। অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে চাষের সরাসরি যোগ রয়েছে। অথচ এবারের বাজেট জলবায়ু বদলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মতো চাষের কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

অসুস্থ উদ্ভিদ

রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলি ২০২০ সালকে আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ স্বাস্থ্য বছর হিসেবে ঘোষণা করেছে। উদ্ভিদ স্বাস্থ্য রক্ষা পেলে অনাহার, দারিদ্র দূর করা যায়, পরিবেশ সুস্থ হয় এবং আর্থিক উন্নয়নও হয়। এসব নিয়েই সচেতনতা গড়ে তুলতে ও

গাছ, ফসলের যত্ন নেওয়ার জন্য দেশগুলি যাতে পদক্ষেপ নেয় সেই কারণেই ২০২০ কে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে বাজেটে একটা কথাও বলা হয়নি। তাই উদ্ভিদ স্বাস্থ্য বা ফসল সুরক্ষায় বিষময় চলতি পদ্ধতিই চালু থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্যান্য বরাদ্দ

ফসলের দামের স্থিরতা বা প্রাইস স্টেবিলাইজেশন স্কিমের জন্য ২০০০ কোটি টাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি বা ফার্ম মেকানাইজেশনে ৬০০ কোটি টাকা, পি এম কিষান সম্মান নিধি বা চাষিদের পেনশন স্কিমে ২২০ কোটি টাকা, পি এম আশা বা চাষিদের আয়ের সুরক্ষার জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বর্তমান বাজেটে। এছাড়া চাষিদের বছরে ৬০০০ টাকা করে কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান দেয়। তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৫ হাজার কোটি টাকা।

কৃষি গবেষণা এবং উন্নয়নের কাজে ৮৩৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গতবছর যা ছিল ৭৮৪৬ কোটি টাকা। প্রাণী ও মৎস্য সম্পদ দফতরের জন্য যথাক্রমে ৩,২৮৯ ও ৮২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শেষের কথা

আর্থিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে ৬ বছর ধরে ভারতের চাষ ব্যবস্থায় কোনো উন্নতি হয়নি। আর আমরা দেখছি, ফসলের দাম না পাওয়া, ঋণের বোঝা, চাষিদের আত্মহত্যা আর দূষণে কৃষির ওষ্ঠাগত প্রাণ। তাই অর্থমন্ত্রী যতই কৃষির পুনরুজ্জীবনের কথা বলুন না কেন, ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেট থেকে তার কোনো দিশা দেখা যাচ্ছে না।

সুস্থায়ী চাষের বাজেট

২৫/৬৯

সুব্রত কুন্ডু

প্রচুর বাইরের সামগ্রী যেমন রাসায়নিক সার, বিষ, বীজ নির্ভর চাষের এখনও রমরমা। এতে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল, মাটি, জৈব বৈচিত্রের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। তেমনই জলবায়ু বদলের অন্যতম কারণও এই চাষ। তবুও সরকার এখনো এই চাষেরই প্রসার করছে। অন্যদিকে ক্ষুধা নিবৃত্তি, দারিদ্র মোচন, সুস্থায়ী পরিবেশসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যও কাজ করার অঙ্গীকার করেছে আমাদের সরকার। যদি সত্যিই সুস্থায়ী উন্নয়ন চাই, তবে দ্রুত সবুজ বিপ্লবের নেশা ছেড়ে আরো দায়বদ্ধ, পরিবেশমুখী সুস্থায়ী কৃষিনীতি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। একথা এই চাষের কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনেরা বরাবরই বলে আসছে।

এর অর্থ চাষিদের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। রাসায়নিক সার, বিষ, জল এবং শক্তির জন্য ভরতুকি বন্ধ করে জল, মাটি, জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণ যারা করবে, তাদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহ দিতে হবে। পুষ্টি ও গুণমান সম্পন্ন ফসলের উৎপাদনে গুরুত্ব দিতে হবে। চাল ও গমের জমি আনুপাতিকভাবে কমিয়ে ছোট দানার ফসল, তেলবীজ, সবজি, ডাল উৎপাদনে গুরুত্ব দিতে হবে। মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি প্রাণীজ খাদ্যের দেশী জাতের উন্নয়ন এবং তার প্রসার করতে হবে। এক্ষেত্রে ছোট ছোট উৎপাদকদের চাষেই আর্থিক সহায়তা দিতে হবে।

প্রাথমিকভাবে সাশ্রয়ী দামে খাদ্য এবং পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে সরকারকে। এসবই করতে হবে দেশের মোট কৃষিজ পণ্যের চাহিদাকে মাথায় রেখে। নাগরিকদের দায়িত্ববান ভোক্তা করে তুলতে ব্যাপক প্রচার এবং কিছু কিছু নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্য আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি হল, খাবারের অপচয়। ফসল কাটার পর থেকে খাবারের থালা পর্যন্ত প্রায় ৩০ শতাংশ খাদ্যের অপচয় হয়। যে দেশে একটা বিরাট অংশের মানুষ দুবেলা ভালো করে খেতে পায় না, সে দেশে এই অপচয় একটা অপরাধ। এটা রুখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, ভোক্তারও। একবার ভাবা দরকার, যদি এই অপচয়ের বেশ খানিকটা কমানো যায় তবে কত খাবার বাঁচানো যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যারা সরাসরি কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করে না তারাই খাবারের অপচয় বেশি করে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল জামাকাপড়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের পোশাকের প্রয়োজন। ভোগবাদের যুগে, দরকার না থাকলেও প্রচুর জামাকাপড় আমরা কিনি। যার বেশিরভাগই সিন্থেটিক। এটা পরিবেশের পক্ষে সুস্থায়ী নয়। এই অপচয় কমাতে হবে। এর পাশাপাশি প্রাকৃতিক তন্তুর জামাকাপড় ব্যবহারের ওপরে সরকারি এবং ব্যক্তিগত স্তরে উদ্যোগ নিতে হবে।

দূষণ, জলবায়ু বদল, ঘন ঘন বিপর্যয় এসবের জন্য অপরিমিত ভোগ এবং আকাশচুম্বী লোভই দায়ী। একথা আজ আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। সুস্থায়ী এবং সকলের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। নিতে হবে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং সরকারি স্তরে।

মতামত নিজস্ব

রাজ্যে ভূ-জল কমছে ২৫/৭০

রাজ্যে ভূ-জল বা মাটির তলার জলের পরিমাণ বেশিরভাগ জেলায় কমছে। কেন্দ্রীয় ভূ-জল বোর্ডের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই জলের তল গত ১০ বছরে ২০.১৯ মিটার কমেছে। বর্ধমানে কমেছে ১১.৪৮ মিটার, হুগলিতে ৯.২৫ মিটার, পূর্ব মেদিনীপুরে ১০.৭৫ মিটার আর হাওড়ায় ৯.৫৫ মিটার। ১০ বছরে মুর্শিদাবাদে কমেছে ৮.৫৩ মিটার, বীরভূমে ৭.২৭ মিটার, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৪.২০ মিটার। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর দিনাজপুরেও বিভিন্ন জায়গাতে ভূ-জলের তল নেমেছে। তবে জলতল কিছুটা বেড়েছে বাঁকুড়া, দার্জিলিং, নদিয়া এবং পুরুলিয়া জেলায়। সামনেই বোরো মরশুম। এই সময়েই এলোপাতাড়ি ভূ-জল তুলে চাষ করার ঝোঁক এ রাজ্যে রয়েছে। এই ঝোঁক ক্রমশ আমাদের বিপদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাটির তলার জল তুলে চাষ কমাতে তাই সচেতনতা জরুরি।

সবজি উৎপাদনে শীর্ষে বাংলা ২৫/৭১

কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের প্রতিবেদন অনুযায়ী সবজি উৎপাদনে গোটা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গ। প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে প্রায় ২ কোটি ৯৫ লক্ষ টন সবজির ফলন হয়েছে এ রাজ্যে, যা দেশের মোট আনাজ উৎপাদনের ১৫.৯ শতাংশ। উৎপাদনের নিরিখে এবারে দ্বিতীয় উত্তরপ্রদেশ। তাদের উৎপাদন ২ কোটি ৭৭ লক্ষ টন। শতাংশের হিসেবে ১৪.৯ শতাংশ। সবজি উৎপাদনে এর পরের রাজ্যগুলি হল মধ্যপ্রদেশ ৯.৬ শতাংশ, বিহার ৯ শতাংশ এবং গুজরাট ৪.৮ শতাংশ। আগের অর্থবর্ষে উত্তরপ্রদেশ প্রথম এবং পশ্চিমবঙ্গ ছিল দ্বিতীয় স্থানে।

সবজি উৎপাদন রাজ্য ধরে হিসেব ২০১৮-২০১৯

রাজ্য	এলাকা (হেক্টর)	উৎপাদন (কোটি টন)	উৎপাদনশীলতা (টন/হেক্টর)
পশ্চিমবঙ্গ	১৪, ৯০, ৩০৯	২.৯৫৫	১৯.৮২
উত্তরপ্রদেশ	১২, ৫৬, ২৭০	২.৭৭০	২২.০৫
মধ্যপ্রদেশ	৮, ৯৭, ৯৯০	১.৭৭৭	১৯.৭৯
বিহার	৮,৭২, ৫৫০	১.৭০০	১৯.১৪
গুজরাট	৬, ২৬, ২৬০	১.২৫৫	২০.১৪

বিন্যাস ও পরিবেশনায় সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা : ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস,
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু